অনেকের গল্প বা ভ্রমণপথিক বাঙালিনী

শ্রেয়সী চক্রবর্তী

অনেক সময় ধরে অনেক রকম মেয়েদের ভ্রমণের গল্পই "অনেকের গল্প"। কেননা পূর্বসূরীদের সেই প্রয়াস রক্তে বহন করে উত্তরসূরী অনেক মেয়ে নিজের সমাজ নিরপেক্ষভাবে জীবন সাজিয়ে নিচ্ছেন আজকে। এমনকী সাম্প্রতিক অধুনায় মেয়েরা চাকরিসূত্রে বাইরে গেলেও খুলে যাচ্ছে তাদের কাছে ভ্রমণের ব্যক্তিগত উদ্যোগের চাবিকাঠি। তাই সেকালের মুষ্টিমেয়ের গল্প আজ একালে অনেকেরই গল্প। এ গল্প দূরকে কাছে আনার পরণকথা। এ কথার শুরুটা কলকাতার ঊনবিংশ শতকে। কিন্তু সে কথা বলার আগে, মৃণালকে মনে আছে নিশ্চয়ই? হ্যাঁ, 'স্ত্রীর পত্র' গল্পের বিদ্রোহিণীর কথাই বলছি। মৃণালের জবানি তে জানা যায় তার যে রূপ আছে তা ভুলে যেতে তার ধনী স্বামী এবং গোঁড়া শ্বশুরবাড়ির একেবারেই বেশি সময় লাগেনি, কিন্তু তার যে বুদ্ধি আছে, পদে পদে হোঁচট খেয়ে তার তা এক মুহূর্তও ভুলতে পারেনি! ভাগ্যকে বেশি দোষারোপ না করেই বলা যায় বাংলাদেশের বাংলাভাষী মেয়েদের মনের এই সবচেয়ে বড় কথাটা শুধু রবীন্দ্র-ছোটোগল্পের নায়িকা মৃণালের-ই নয়, উনিশ শতকের অজস্র বাঙালি মেয়ের জীবনের দগদগে সত্য, তা তার শাঁখা-সিঁদুরের বন্ধন কিম্বা 'বাপের বাড়ির' তাড়না-যাই থাকুক না কেন! আশাপূর্ণার প্রথম প্রতিশ্রুতির নায়িকা সত্যবতীর কন্যা, পুরী দেখতে যাওয়ার উদগ্র বাসনার হাঁড়িকাঠে বলি হয়ে যাওয়া সুবর্ণলতাটির কথা কেউই খুব সহজে ভুলে যাননি আশা করি।

পূর্বকালে এবং বর্তমানে বাঙালি মেয়ের রূপের খ্যাতি, তাঁদের অতুলনীয় রন্ধনের সুস্বাদ, ইত্যাদি বিষয়ে চার্চিকদের কমতি নেই। অথচ সুখী গৃহকোণের পিঞ্জর ছেড়ে বেরোবার যে অদম্য ইচ্ছে...তা নিয়ে কণা মাত্র আলোচনাও কি চোখে পড়ে? উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে আলোকায়ন প্রাপ্ত এবং অপ্রাপ্ত বাঙালি মেয়েরা ভ্রমণ শুরু করেন। অন্তত ওই সময় থেকেই ভ্রমণের ঈপ্সা গড়ে উঠতে দেখি বাংলা সমাজের অর্ধাঙ্গিনীদের চেতনায়। পথ ছিল বন্ধুর, সময় ছিল পিছল...তবু মেয়েরা নিজেদের চোখে দেখে জীবনের স্বাদ মনের বাটি-চামচে ডুবিয়ে চেখে দেখেছেন, বড়ো পরিতৃপ্তি তে। আর এই খুশিমনের ছোটো ছোটো আলোকরশ্মি তাঁরা ছড়িয়ে গিয়েছেন বাংলা সাহিত্যের এক গভীর নির্জন পথে...সে

পথ ভ্রমণ-কথার, বলা ভালো ভ্রমণ-অভিজ্ঞতার পথ। এই ভ্রমণ কাহিনির বেশিটাই আসে স্মৃতির চলচ্ছবি হিসেবে। আবার খুব বুদ্ধি করে আত্মকথার বীজও বুনে দিলেন অনেকে ভ্রমণকথার মধ্যে।

প্রথম দিকে ঘরের আর বাইরের শাসন সামলে মেয়েরা বেরিয়েছেন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে, তাতে পিছপা হওয়া তো দূরের কথা বরং তাঁদের উৎসাহ আরও বেড়ে যায় যখন দেখেন কৃষ্ণভাবিনী দাসের মতন মহীয়সী পাছদুয়ারে পড়ে থাকা আকাশ বাতাসের ইশারাকে আঁকড়ে ধরে এমনকী নিজের মেয়েকেও হারিয়ে স্বামীর সঙ্গে পা রাখলেন ইংল্যান্ডে-এ! ক্রমশ লিখলেন 'ইংলন্ডে বঙ্গমহিলা'-র মতো বই, যা বাংলা ভাষায় লেখা বাঙালি মেয়ের প্রথম ভ্রমণকাহিনি (১৮৮৫)। আজও মেয়েদের নিজের কালে নিজের সমাজে নিজের দেশে কোনো কিছু প্রথমবার করে দেখাতে গেলে যে কত বড় পাহাড় ডিঙোতে হয় তার জরিপ পুরোপুরি করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। যে কারণে জেন্ডার স্টাডিজ এর রমরমা আশ্রয়ে পাশ্চাত্য আর প্রাচ্যের কোনো ভেদ নেই আজ।

কৃষ্ণভাবিনীর মতো অশেষ দুর্গতি আর যন্ত্রণা কাউকেই সহ্য করতে হয়নি, এ কথা হলফ করে বলা যায়। তবে খুব সহজেই এই পৃথিবীকে তাঁরা পান্থনিবাসে পরিণত করেছেন, প্রাপ্ত সমীকরণ এমন সহজ ইঙ্গিত দেয় না মোটেই। আসলে স্বাধীনতা, নিজের খুশিমতো বাঁচার অধিকার,মেয়েদের জন্য আজকালকার মতোই তখনো ছিল দুর্লভ। আমাদের দেশের ঠানদিদের মুগ্ধ করে রাখা শাস্ত্র বলে 'পথিনারীবিবর্জিতা'... খোদ রামায়ণে চিত্রকূট দর্শনে সীতার যে উল্লাস তা আসলে কেবলই কবিকল্পনা! আর সেখানে বিভিন্ন সংস্কার-কুসংস্কারের পাকে পাকে জড়িয়ে থাকা বাঙালি সমাজের থোড়-বড়ি খাড়া রাখার জন্য মেয়েদের যে বিশেষ করে ত্যাগ স্বীকার করতেই হত (এমনকী আজো হয়) সে তো জানা কথা। তবুও কৃষ্ণভাবিনীর পর দলে দলে এসেছেন স্বর্ণকুমারী, প্রসন্নময়ী, শরৎরেণুদেবী, দুর্গাবতী ঘোষ, বিমলা দাশগুপ্ত, রাজলক্ষ্মী দেব্যা, সারদাসুন্দরী, সৌদামিনী, গিরীন্দ্রনন্দিনী, অমলাশঙ্কর, হরিপ্রভা তাকেদা, হেমলতা সরকার, রাণী চন্দের দল। তাঁরা ছড়িয়ে পড়েছেন রাজস্থানের অখ্যাত প্রদেশ ধোলপুর থেকে য়ুরোপের প্রাণকেন্দ্র প্যারিস-এ। কেউ গিয়েছেন কাশ্মীর থেকে নরওয়ে তাও আবার নিজের ইচ্ছেয় একাধিকবার, নেপাল থেকে জাপানে (নেহাতই সাধারণ বাঙালি মেয়ে সেখানে জাপানের বধূ, কিন্তু বিপ্লবী বধূ), কেউ গিয়েছেন নেফা, কন্যাকুমারী হয়ে হিমাদ্রিশীর্ষে, ডুব দিয়েছেন পুর্ণকুম্ভে, কেউ কেউ বেড়িয়ে এসেছেন 'জেনানা ফাটক' এর অন্তরালে সকৌতূহল! কেউ গিয়েছেন স্বামীর হাত ধরে, সাহচর্যের

আশ্বাসে, কেউ গিয়েছেন নিগড় ভেঙে, কেউ নিজের মতো করে নিয়ম ভাঙা সংরাগে, দুশ্চিন্তার ঝুলি পিছনে ফেলে রেখে আর কেউ কেউ কোনো সমাজকর্তা কিম্বা স্বামী-শাসনের তোয়াক্কা না করেই শুধু নয়, নিতান্ত অক্লেশে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছেন সম্পর্কের অস্বীকৃতির বিনিময়ে, যেমন নবনীতা দেবসেন।

এই মেয়েরা গিয়েছেন যে পথে সে পথেই যেন তাঁদের মেয়ে জীবনের উদ্‌যাপন। ছোটোখাটো ভাবনা থেকে বড়োসড়ো সিদ্ধান্ত, নিজের জীবনের কিছু সময় নিজের একান্ত ইচ্ছের হাতে সঁপে দেওয়ার এই আহ্লাদের উত্তাপ দুশো বছর পেরিয়েও পাঠকের হৃৎপিন্ড স্পর্শ করে বুঝিয়ে দেয় সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা কেবলই টিকে থাকেননি, তাঁরা রীতিমতো বেঁচে আছেন। আমরা এখানে কয়েকজনকে বেছে নিচ্ছি সরস ভ্রমণকথার অসামান্য উৎস হিসেবে। এঁদের কেউ কেউ মাত্র একটিই বই লিখেছেন। আবার কেউ একাধিকের আয়োজন করেছেন ভাবী পাঠকের জন্য। প্রথমেই কৃষ্ণভাবিনী দাসের কথা।

কৃষ্ণভাবিনী দাসের বিলেত ভ্রমণ সর্বার্থেই তীব্র সংগ্রামের কাহিনি। এবং বলা যায় 'আজব'। আজব এইজন্য নয় যে, কৃষ্ণভাবিনীর বিলেত ভ্রমণের সময় খুব মজার মজার ঘটনা ঘটেছিল বা তাঁর কোনো অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা হয়েছিল। তবুও আজব এবং অভূতপূর্ব তাঁর লন্ডন-ভ্রমণ এই কারণে যে তাঁর নিজগৃহেই অদ্ভুত বা উদ্ভটতম দেশাচার-কালচার-এর সাক্ষী হতে হয়েছিল কৃষ্ণভাবিনী-কে, যার নিষ্ঠুরতায় তাঁর বেঁচে থাকার শেষ দিন পর্যন্ত মানসিক যন্ত্রণা ছিল তাঁর বিশ্বস্ত সঙ্গী, যা কিনা খুব আশ্চর্যজনক ভাবে তাঁর পরবর্তী অন্য কোনো মহিলাকেই ভ্রমণের কারণে সহ্য করতে হয়নি। তাই মেয়েদের ব্যাগ গোছানোর গল্পে প্রথমেই হাজির হন এই প্রগাঢ় পিতামহী কৃষ্ণভাবিনী দাস, যাঁর 'বেড়াতে যাওয়া'য় আনন্দের ভাগ ততটা ছিল না যতটা ছিল পরিজনকে ত্যাগ করার বেদনা, দেশ ছেড়ে যাওয়ার অনিশ্চয়তা আর মেয়েজীবনের প্রচলিত গড়নের বাইরে গিয়ে স্বাধীনতা খোঁজার উদগ্র প্রয়াস।

কৃষ্ণভাবিনী গ্রাম-বাংলার মেয়ে। রবীন্দ্রনাথের থেকে তিন বছরের ছোটো। মাত্র ২০১৪ সালে কৃষ্ণভাবিনীর জন্মের সার্ধ-শতবর্ষ পেরিয়ে গেল নিশ্চুপে! কৃষ্ণভাবিনী ১৮৬৪-তে জন্মেছিলেন বহরমপুরে কিম্বা নদীয়ায়, মেয়েদের খবর সে সময় সঠিকভাবে কেই বা মনে রাখার প্রয়োজন বোধ করত? অথচ একটা ব্যাপারে কৃষ্ণভাবিনীর একটু সৌভাগ্য হয়েছিল, ওই গ্রামবাংলার প্রচলিত রীতি ভেদ করেই তাঁর হাতেখড়ি হয়েছিল! কিন্তু ওই পর্যন্তই। দশ বছর বয়সে তাঁর বিয়ে হয় বিদ্যাসাগরের বন্ধু শ্রীনাথ দাসের ছোটো ছেলে দেবেন্দ্রনাথ দাসের সঙ্গে।

কৃষ্ণভাবিনীর বড়োভাসুর উপেন্দ্রনাথ দাস বিধবাবিবাহ করেছিলেন এবং তাঁর বাবা যদিচ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বন্ধু, তবু সেই বিয়ে তিনি মোটেও মেনে নেন নি। ফলে এহেন প্রগতির ধ্বজাধারী শ্বশুরমশাই এবং শ্বশুরবাড়ি পেয়ে কৃষ্ণভাবিনীর খুব আহ্লাদ হওয়ার কথা নয়। আর ঘরের চৌকাঠ ডিঙোনো তো দূর, ঘোমটা খোলার অবকাশই তাঁর মেলার কথা নয়। তবু মেঘকে যে ঠেলা দেয় সেই তেপান্তরের বাতাসের খবর কে রাখে? তাই কৃষ্ণভাবিনীর প্রথম সন্তানটি মৃত আর জীবিত মেয়েটির বয়স পাঁচ বছর। প্রথম থেকেই কৃষ্ণভাবিনী তাঁর স্বামীর বিলেত যাওয়ার পক্ষে, বলা ভালো কালাপানি পেরোনোর পক্ষে ছিলেন, কারণ তখন সেটাই ছিল কলকাতার সংস্কারকামী নব্যসম্প্রদায়ের দস্তুর; এখনকার ভাষায় 'ইন থিং' চেতনার প্রকাশ। তাই দেবেন্দ্রনাথ দেশে ফেরার পর কৃষ্ণভাবিনীর শ্বশুর তাঁকে গ্রহণ না করে যখন গৃহ এবং সমাজচ্যুত করলেন তখনো স্বাভাবিক ভাবেই কৃষ্ণভাবিনী স্বামীর পাশেই থাকলেন। অর্থাৎ ধনী শ্বশুরবাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন প্রগতির রাজপথে। মনে রাখতে হবে এর বেশ কয়েক দশক আগে থেকেই কলকাতার স্ত্রী শিক্ষার প্রক্রিয়া এবং প্রয়োগ শুরু হয়েছে (১৮৪৯-এ বেথুন স্কুলের প্রতিষ্ঠা)। কৃষ্ণভাবিনীর সমস্ত শিক্ষাই কিন্তু স্বামী দেবেন্দ্রনাথের কাছে, ঘরের ভিতরে সম্পন্ন হয়েছিল। তাই স্বামী-স্ত্রী ছাড়াও অন্য আকাশের ইঙ্গিতবাহী ছিল তাঁদের মধ্যেকার সম্পর্কে। সেটা এতটাই তীব্র স্বাধীনতাকামী যে দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে বাড়ি ছাড়ার সময় কৃষ্ণভাবিনী তাঁর মেয়ে তিলোত্তমাকে শ্বশুরবাড়িতে রেখে যেতে বাধ্য হলেও সেটাই মেনে নিয়েছিলেন। তারপর যখন দেবেন্দ্রনাথ কলকাতার বিরুদ্ধ বাতাসে আর ভেসে থাকতে পারলেন না তখন স্ত্রী সমেত লন্ডন ফিরে যাওয়া মনস্থ করলেন। এবং অবশ্যই শ্রীনাথ দাস, কৃষ্ণভাবিনীর শ্বশুর, তিলোত্তমাকে মা-বাবার সাথে লন্ডনে পাঠানোর চরম বিরোধিতা করে তাকে জোর খাটিয়ে কলকাতায় নিজের কাছে রেখে দিলেন।

স্বাধীনতা পিয়াসী কৃষ্ণভাবিনী এই ব্যবস্থা ক্ষুব্ধ চিত্তে মেনে নিতে বাধ্য হলেন, কারণ তিনি তাঁর স্বপ্ন সত্যি করার পথের কোনো বাধাকেই আমল দিতে প্রস্তুত ছিলেন না এবং পরবর্তীকালে এই সিদ্ধান্তের তিক্ত জের তিনি সারাজীবন একা বয়েছেন। তবু তাঁর রক্তের অন্তরালে যে অজানা জীবনের অচেনা অভিজ্ঞতার হাতছানি খেলা করে গেছে তার আকর্ষণ তিনি কখনো উপেক্ষা করতে পারেননি। তাই ১৮৮২ সালে ইংরেজ পোশাকে নিজেকে মুড়ে, বিলিতি আদব-কায়দা রপ্ত করে স্বামীর সঙ্গে কৃষ্ণভাবিনী বেরিয়ে পড়লেন অসীমের আহ্বানে। তাঁর নিজের কথায়, '*২৬শে সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার রাত্রি সাড়ে আটটার সময় বোম্বাই হইয়া*

ইংলন্ডে যাইবার জন্য আমার স্বামীর সহিত হাবড়া স্টেশনে আসিয়া কলিকাতা হইতে রওনা হইলাম আজ আমি মুখ খুলিয়া কলের গাড়িতে উঠিলাম।... এবং বলছেন, *'বহুদিন হতে হৃদয়ে আমার/ গোপনে রয়েছে এক আশালতা/ দেখিবার তবে প্রিয় স্বাধীনতা/যাইব যে দেশে বসতি উহার...তাই বহুকষ্টে পিঞ্জর ভাঙ্গিয়ে/হয়েছি বাহির জ্ঞানচক্ষু তবে...'* তারপর সোনার শিকল কেটে বেরোনোর কী আকুল আনন্দ! আসলে কৃষ্ণভাবিনীর কাছে লন্ডন পৌঁছে সেখানে শুধু ঘুরেই দেখছেন না, সেখানে বসতি করছেন কৃষ্ণভাবিনী। আট বছর লন্ডনে কাটিয়ে শাসকের দেশকে নিজের চোখে আঁকছেন, নিজের ভাষায় মুদ্রিত করছেন। আর এখানেই অন্যতমা মহীয়সীর জন্ম দিচ্ছে বাংলা ভাষা। কারণ কৃষ্ণভাবিনী দাস সেই প্রথমা যিনি বাংলা ভাষায় প্রথমতম বিলেত ভ্রমণের কাহিনি ১৮৮৫ সালে দেশের মানুষকে জানাচ্ছেন ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখে। বিলেতে কৃষ্ণভাবিনীর আগে এবং প্রায় সমসময়েই গিয়েছেন, থেকেছেন তরু দত্ত, রাজকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অবশ্যই ঠাকুরবাড়ির জ্ঞানদানন্দিনী দেবী। তাঁরা কেউই ভ্রমণকাহিনি লেখেননি, আর জ্ঞানদানন্দিনীর বিলেতবাসের স্বল্প অভিজ্ঞতা কোনোমতেই ভ্রমণকাহিনি হয়ে ওঠার দাবি করতে পারে না। তাছাড়াও জ্ঞানদানন্দিনী পেয়েছিলেন স্বামী সত্যেন্দ্রনাথের সাহচর্যের সঙ্গে শ্বশুর দেবেন্দ্রনাথের সম্মতি, যা তাঁকে তৎকালে অন্যতমা আধুনিকা হয়ে ওঠার বন্দোবস্ত করে দিয়েছিল। নইলে জ্ঞানদানন্দিনীর শ্বশুরবাড়ির অন্দরমহলে সে আমলের মেয়েলি ব্যবহার সাধারণ বাঙালি পরিবারের থেকে খুব যে অন্যরকম ছিল না তার পরিচয় ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী সম্পাদিত জ্ঞানদানন্দিনীর স্মৃতিকথা *'পুরাতনী'* পড়লেই জানা যায়। তাই কৃষ্ণভাবিনীর *'ইংলন্ডে বঙ্গমহিলা'*কে শুধু ভ্রমণকথা নয় পড়তে হয় বাঙালি নারীর প্রথম ভ্রমণ অভিজ্ঞতা হিসেবে। কারণ এর সাথে তাঁর জীবনের ট্রাজেডি জড়িয়ে রয়েছে পাকে পাকে।

কলের গাড়িতে অর্থাৎ ট্রেনে কলকাতা থেকে এলাহাবাদ, জব্বলপুর হয়ে বোম্বাই, আধুনিক মুম্বাই পৌঁছচ্ছেন কৃষ্ণভাবিনী। পথের বিবরণ দিচ্ছেন খুশিমনে। তারপর বম্বে থেকে জাহাজে ভেনিস হয়ে পাড়ি দিচ্ছেন লন্ডন। পথে সে নানান অভিজ্ঞতা। এডন বন্দরে নানা মানুষ দেখা, পোর্ট সইদে গা ছমছমে অনুভূতি, সমুদ্রপীড়া সব কিছুই নতুন কৃষ্ণভাবিনীর কাছে। তারপর লন্ডনে যখন নামছেন ঘুরে দেখছেন পার্লামেন্ট থেকে বাকিংহাম প্রাসাদ। লন্ডনের বাইরের ইংল্যান্ড তাঁকে টানছে আলো আর রঙের ইশারায়। আসছে আল্পসের গায়ে ট্রেনে চড়ে ঘুরে বেড়ানোর বিপুল গতিময় উচ্ছ্বাসের বর্ণনা। সেখানকার নারীপুরুষের সামাজিক আদান-প্রদান, শিক্ষাপ্রণালী, ঘরের কাজ আর বাইরের কাজে নারীর ভূমিকা,

ঋতুপরিবর্তনের চরিত্র, সব দেখছেন বুঝছেন খুঁটিয়ে। লিখছেন-ও সেভাবে। তাই কৃষ্ণভাবিনীর লেখা ভ্রমণবৃত্তান্তে শুধু উনিশ শতকের ভদ্রমহিলার চোখে নতুন করে ইউরোপ দেখার আনন্দই নয়, বারে বারে উঠে এসেছে নিজের দেশের মেয়েদের এমন কত শত অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকা অন্ধকার অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের কথা ভেবে উষ্ণ যন্ত্রণা। আর অন্যদিকে সেইসময় কলকাতায় তাঁর কন্যার বিয়ে হয়ে যাচ্ছে মাত্র দশ বছর বয়সে ধনী পরিবারের লম্পট পাত্রের সঙ্গে, যার হোতা অবশ্যই কৃষ্ণভাবিনীর শ্বশুর শ্রীনাথ দাস।

আরও বেশ কিছু বছর পর যখন কৃষ্ণভাবিনী দেশে ফিরতে পারছেন, অসুস্থ কন্যাকে এনে শিক্ষিতা নারীর নিজেকে মেলে ধরবার ঈপ্সা ছড়িয়ে দিয়েছেন কলকাতার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়, আর সে বিষয়ে তাঁর মতামতের বিরোধিতা করেছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ! তর্কযুদ্ধে মেতে উঠেছে বিশ শতকের নতুন বাঙালি। কৃষ্ণভাবিনীর কন্যা তিলোত্তমা কিন্তু অভিমানভরে কৃষ্ণভাবিনীকেই দায়ী করে গেছে তার জীবনের এই পরিণতির জন্য। কলকাতার পুরুষশাসিত সমাজ তাকে শিখিয়েছিল এই কৌশল, সেখানে কৃষ্ণভাবিনীর এই ভ্রমণের, এই বেড়িয়ে আসা বিচিত্র জীবনের বিন্দুমাত্র বিশিষ্টতা নেই। সেখানে কেবল আছে মায়ের কর্তব্যে অবহেলা করার অভিযোগ, যা নির্বিচারে সয়েছেন কৃষ্ণভাবিনী। যদিও এ ব্যথার প্রকাশ কোনো ভাবেই ভারাক্রান্ত করেনি কৃষ্ণভাবিনীর ভ্রমণকথা, ১৮৮৫ সালে লেখা 'ইংলন্ডে বঙ্গমহিলা' বইকে, সেখানে ডিটাচড্ ভ্রামণিকের যুক্তি-বুদ্ধি-সারবত্তা সম্পন্ন গভীর মেধাবিনী কৃষ্ণভাবিনী দাস আজকের যুগের এক উজ্জ্বল পুনরাবিষ্কার।

আমাদের পাখায় পিস্টনের উল্লাস,/ আমাদের কণ্ঠে উত্তর হাওয়ার গান'

এরপরের ছবিতে বিশ শতকের বঙ্গসমাজের আলো, শিক্ষিত ইলেক্ট্রিসিটির বিচ্ছুরণ। উনিশ শতকের দেওয়ালগিরির বাতির মিটমিটে কমনীয়তা সে পিছনে ফেলে এসেছে। এ সমাজে বদল এসেছে আধুনিকতার বহিরঙ্গে নয়, সমাজমানসের অন্তরঙ্গেও। তাই এ সময় দলে দলে দেখা পাই হরিপ্রভা, দুর্গাবতী, শরৎরেণু, সরলা কিম্বা অমলাদের! এঁরা চিরকাল-ই ছিলেন সমাজের আভূষণ হয়ে, শুধু বিশ শতকের প্রায় গোড়ার দিক থেকেই এঁদের প্রতি সমাজ-আচরণের, সমাজ- মানসিকতার বদল দেখতে পাই। দেখতে পাই এঁদের ঈপ্সার বাস্তব প্রতিফলন এবং তা নিয়ে অনেকক্ষেত্রেই আম এবং খাস, মূলত সামগ্রিক বঙ্গচেতনার একটি নব্য বিকাশ।

আমাদের লেখায় নির্দিষ্ট ভাবে যে হরিপ্রভা তাকেদা, দুর্গাবতী ঘোষ, শরৎরেণু দেবী বা অমলা নন্দী, সরলা দেবী চৌধুরানীর কথা আমরা বলব, তাঁদের কাউকেই

বেড়াতে যাওয়ার জন্য, শুধু ঘর হতে দুই পা ফেলিয়া বাইরে যাওয়ার কারণে কখনই কৃষ্ণভাবিনীর মতো লাঞ্ছিত হতে হয়নি, উলটে তাঁরা বেড়িয়ে এসে যখন তাঁদের নতুন চোখের আমেরুপর্বত-সসাগরা এই পৃথিবীকে দেখাশোনার বর্ণনা দিয়েছেন তাঁদের ভ্রমণকথায় তখন দিকে দিকে উঠেছে হাততালি, অনেক ক্ষেত্রেই বয়েছে প্রশংসার বন্যা। আবার কিছু ক্ষেত্রে সে উচ্ছ্বাসের ঢেউ কূলপ্লাবী না হলেও অস্বীকৃতির দুর্বিনয় দেখা যায়নি কখনো। বরং তাঁদের ভ্রমণের এই নতুন আনন্দ সঞ্চারিত হয়েছে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে, বিশেষত মেয়েদের মধ্যে, যারা কিনা চিরকালের পরাধীন এবং অবলা (তখনো পর্যন্ত জীবনে, কর্মে ও ভাবনায়)।

এই মেয়ের দলে, কেউ কমবয়সি তাই স্বামীর সঙ্গিনী, কেউ কর্মক্ষেত্রে স্বামীর সহগামিনী আবার কেউ বা রাজনীতির আঙিনায় একক নেত্রী হিসেবেই সমুদ্রযাত্রার নিশান-বাহিনী। শুধু একটি মাত্র ছোটো মেয়ে বিলেত (বড় অর্থে য়ুরোপ) গিয়েছিল তার বাবার সঙ্গে। বয়সের গণ্ডী নির্বিশেষে এঁদের সকলের এই প্রথম সমুদ্রযাত্রার গল্পে তাই 'ঘর হইল বাহির হইল ঘরের' কথা। আর প্রতিবারই সেখানে একটি প্রাথমিক প্রধান স্থান অধিকার করেছে জাহাজের বর্ণনা, সমুদ্রের রূপ-রস-নোনা হাওয়ার নেশা, সমুদ্রপীড়া আর জাহাজের ইংরেজ বা বিদেশি কর্মচারীদের আমাদের দেশীয় মানুষের সঙ্গে ব্যবহারিক আচরণ।

যেমন প্রথমে হরিপ্রভা তাকেদার (১৮৯০-১৯৭২) কথাই ধরা যাক। হরিপ্রভা বসুমল্লিক ঢাকার মেয়ে, সেখানেই বিয়ে করেন জাপানিমানুষ, ঢাকাপ্রবাসী ওয়েমন তাকেদা কে। ওয়েমনের সঙ্গে জাপানের বাঙালি বধূর প্রথম জাপান যাত্রা ১৯১২ সালে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বছর দুই আগে। হরিপ্রভা পরে জাপান গিয়েছেন বহুবার, মূলত: শ্বশুরঘর করতে এবং সঙ্গে বেড়াতেও। এমনকী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়েও তিনি জাপানে গিয়েছিলেন পরিবার, সম্পত্তি এবং দেশের অবস্থা নিরীক্ষণে যার বিশ্বস্ত দলিল তাঁর লেখায় রয়েছে। কিন্তু এক্কেবারে প্রথমবার জাপান যাত্রার সময়ে জাহাজি অভিজ্ঞতা তাঁর কেমন ছিল সেটা তাঁর জবানিতেই শোনা যাক: '৬ই *নভেম্বর-ভোর ৫টার সময় জাহাজ ছাড়িল। বোঝা যায় না যে জাহাজ চলিতেছে।...এই দেশ ছাড়িয়া চলিলাম। বাহিরে ডেকের উপর দাঁড়াইয়া কলিকাতার শেষ দৃশ্যগুলি দেখিতে লাগিলাম। মনটা খুব খারাপ বোধ হইল।.....প্রায় ৬০০ ছাগল ভেড়া এই জাহাজে করিয়া সিঙ্গাপুর যাইতেছে। সেইগুলি আমাদের খুব নিকটে। বাথরুমে ঐগুলির পাশ দিয়া যাইতে হয়। আর আমাদের ঘরের পাশে জাহাজের ভাঁড়ার ঘর। খাদ্যদ্রব্যাদি সব এই ঘরে থাকে। সে ঘরে বোধ হয় শুকনো মাছ আছে। এই দুইয়ের গন্ধে আমরা আর টিকিতে পারি না।....খাওয়ার পর মুখ*

ধুইতে যাইবার সময় ক্ষুদ্র জানালা দিয়া দেখি, এখন জল ঘোর সবুজ-নীলাভ। বুঝিলাম এবার সত্যসত্যই সমুদ্রে পড়িয়াছি। ভারী আনন্দ হইল.... বৈকালে এসরাজ বাজাইলাম। বসিবার স্থান নাই। বিছানায় বসিলে উপরে মাথা ঠেকে। উপরের ডেকে অনেক লোক, নীচে ছাগল।... **['বঙ্গমহিলার জাপান যাত্রা', হরিপ্রভা তাকেদা, ১৯১৫, ঢাকা]** হরিপ্রভা ঢাকা থেকে কলকাতায় এসেছিলেন জাহাজে আর কলকাতা থেকে জাপান যাওয়ার পথে রেঙ্গুন পেরিয়ে যাওয়ার পর জাহাজের ক্যাবিনে কথঞ্চিৎ শান্তি লাভ করেছিলেন; কিন্তু এ কথা আপাতত তুলে রেখে পাড়া যাক শরৎরেণু রায়-এর জাহাজি দিনের অভিজ্ঞতার কাহিনি।

শরৎরেণু দেবী (রায়) রচিত 'পারস্যে বঙ্গ-রমণী' ১৯১৬ সালে লেখা ভ্রমণকথা। এ কথায় ভ্রমণের চেয়েও বেশি আছে ভ্রমণ পথের কথা, জাহাজের কথা, এবং বিশেষত ভ্রমণ সংক্রান্ত সমগ্র ব্যবস্থাটির সামূহিক অব্যবস্থার কথা। শরৎরেণু অত্যন্ত সাধারণ বাঙালি 'ভদ্রমহিলা', স্বামীর সঙ্গে যাচ্ছেন পারস্যে (আমাদের এখনকার মিডল ইস্ট), যাত্রাপথ তাই অন্য অন্য ভ্রমণকারিণীর থেকে একটু ভিন্ন; করাচি-মাস্কাট-বুশায়ার-মেহোমেরা (আজকের দিনে ইরানের খোররামশাহর)-আওয়াজ। এখানেই 'Persian Oil Company'-র অতি সামান্য কর্মচারীর স্ত্রী-এর স্থিতি। শরৎরেণু বলছেন, '*আমাদের জাহাজখানি তিনতলা। একতলায় ডেক-যাত্রীগণের ও খালাসীদের থাকিবার স্থান।.... ডেকের যাত্রীগণকে উপরেরTwin deck-এ Hatch-এর উপর বা foredeck-এও যাইতে মানা ছিল না; তবে দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী দিগের বসিবার বা বেড়াইবার স্থান একেবারেই ছিল না, কারণ দ্বিতীয়শ্রেণীগুলি এঞ্জিনঘরের পিছনে বলিয়া ভয়ানক গরম।.... দ্বিতীয়শ্রেণীতে একটিও Berth খালি ছিল না। আমাদের নাম লেখা Berthগুলিও অন্য লোক আগে হইতে আসিয়া দখল করিয়াছিল Steward এমনকি Chief Officer কে বলিয়াও আমরা আমাদের Berth পাইলাম না।...*' পথে আরও নানা বিপত্তির ফিরিস্তি আছে শরৎরেণুর লেখায়। কখনো অসুস্থতা, কখনো গাছতলায় রাত কাটানোর বন্দোবস্ত, কখনো স্বামীর অসুস্থতার, কুলি না থাকায় নিজেদের সমস্ত মালপত্র অসহায়ভাবে নিজেরা বহন করা, চারপাশের নতুন মানুষজনের অল্প ফিরিস্তি এবং আবার মেহোমেরা থেকে আওয়াজ যাত্রাপথে জাহাজের নরক-দর্শন বর্ণনা। সমস্তটাই বিলাস বা আরামবিহীন দুর্ভোগের মর্মান্তিক চিত্র। তবু তারই মধ্যে জেনে নিচ্ছেন এবং জানিয়ে দিচ্ছেন লেখিকা বাজারে নানারকম খেজুরের কথা, মরুভূমির মতো বিশাল মাঠ আর 'কারুণ' নদীর কথা, পার্সিয়ান ও আরবি সহনাগরিকের কথা... '*কি ধনী কি গরীব সকলের নিকটেই বন্দুক থাকে। রাস্তায় যখন তাহারা চলাফেরা করিয়া বেড়ায়, তখন*

বন্দুক তাহাদের সঙ্গেই থাকে।' লেখার দ্বিতীয় পর্বের শেষে আরও পারস্য কাহিনি শোনানোর কথা শরৎরেণু রেখেছিলেন বলে মনে হয় না। তাঁর আর কোনো লেখার সন্ধান মেলেনি এই একটিমাত্র গরিবানা লজ্জা আর আতঙ্কের ছিটে মাখানো বিদেশ বেড়ানোর গল্প ছাড়া। এর আরও দেড় দশক পরে কাছাকাছি সময়ে (বিশ শতকের তিন দশকে) জাহাজেই য়ুরোপ পাড়ি দিচ্ছেন দুর্গাবতী ঘোষ এবং অমলা নন্দী। আর জাহাজে চড়ে একা একা বার্মা (মিয়ানমার) যাচ্ছেন সরলা দেবী চৌধুরানী। ঘুরতে যাচ্ছেন না কিন্তু লিখে ফেলছেন আস্ত একটি ভ্রমণ কাহিনী 'বার্ম্মা-যাত্রা'! সরলা দেবী সেসময় জাতীয় রাজনীতির অঙ্গনে এক সুপ্রতিষ্ঠিতনাম, বিদূষী বলে খ্যাতি তাঁর চিরকালই ছিল। তাই তাঁর দেওয়া জাহাজ-যাত্রাপথের অতিবাহিত দিনগুলি সমুদ্রপীড়া বা sea sickness এর কবলে পড়ে খাবি খাওয়ার গল্পই নয় কেবল। জাহাজে সহযাত্রীদের ছোটখাটো আচরণ তাঁর মনকে দোল দিয়ে যায়... '*... একটিমাত্র দম্পতি পরস্পর কথোপকথনে নিযুক্ত ছিল। পতিটিকে কিছুতেই য়ুরোপীয় মনে হল না, গৌরাঙ্গ বটে,—পুরো সাহেবী পোষাক, হাবভাব, উঠা-বসাও বটে। কিন্তু তবু মুখে এমন একটা কি দুর্বলতা মাখানো ছিল, যাতে স্বাধীনচেতা লোক বলে মনে হয় না। পরে জানাতে পারলুম যে ইহুদি। —রেঙ্গুনে তার অতি নিকট আত্মীয়দের সঙ্গে আলাপ পরিচয়ে তার মেমবধূ পরিগ্রহের ইতিবৃত্তও জানতে পেরেছিলুম। জাহাজে দম্পতির আচরণ একেবারে আদর্শ সদ্য বিবাহিত নুতন প্রেমিক-প্রেমিকার মত। সর্বদাই দুজনে নিরালায় বসে আছে। দুপুর বেলা 'লাউঞ্জে' (আরাম গৃহে) মেমবধূ একখানি কৌচে নিদ্রিতা, মাথার কাছে চৌকি টেনে বসে বর খবরের কাগজ পড়তে পড়তে তার রক্ষকতা করছেন। তাঁদের আশেপাশে অন্য কৌচে বা চেয়ারে অন্য যাত্রীরা স্ব স্ব পাঠে ব্যাপৃত। বউ যদি ডেকে না উঠেন, বরেরও দেখা পাওয়া যায় না।*' চমৎকার সপ্রতিভ ইঙ্গিতময় বর্ণনা। ঠাকুরবাড়ির সংস্কৃতির বহুপ্রচল রসবোধের ধারাটিও অক্ষুণ্ণ। প্রাদেশিক হিন্দু কনফারেন্সের বিধবা, স্বাবলম্বী সভানেত্রীর মানসপটে প্রতিফলিত অধুনা মায়ানমারের তৎকালীন ধর্ম, মানুষ, জাতিগত দাঙ্গা, বর্মি মেয়েদের রূপসজ্জা-পোশাক, নব্য বর্মি যুব সম্প্রদায়ের রাজনীতি, শিক্ষা রুচির ধ্যানধারণা এবং বর্মা-স্থিত শিক্ষিত উচ্চবিত্ত বাঙালি সম্প্রদায়ের মননের ছবি সরলা সরাসরি এঁকেছেন তীক্ষ্ণলেখনে।

উদাহরণ:

১। 'আমার সঙ্গে পরিচয় করাবার জন্যে বার্দুন সাহেব সেদিন তাঁদের দেশের চারপাঁচ নব্য যুবতীকে আমন্ত্রণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে একটি খ্রিষ্টান,

আবাল্য মিশনারীদের হাতে মানুষ, কলেজে পাশ করা-নাকে চোখে মুখে কথা কন...এমন হাসিমুখী, জীবন্ত, প্রাণবন্ত মেয়ে উপস্থিত সবাইকেই প্রাণবন্ত করে তোলে। প্রাচ্য সমাজের আদর্শ তা হয়ত নয়; কিন্তু মনুষ্য সমাজে সেটা সর্বত্র আদরণীয়। মেয়েটি শীঘ্রই গভর্নমেন্টের বৃত্তি নিয়ে বিলেতে যাবে—বিলেতের সমাজে সে নিজের মার্কা মারতে পারবে সন্দেহ নেই।...একটি বিবাহিত বর্মিজ মেয়ে স্বামীসহ সে ডিনারে উপস্থিত ছিল। সে একেবারে চুপচাপ। শুনলুম বিবাহের পূর্বে সে খুব চটকদার ও কইয়ে-বলিয়ে ছিল। ভদ্র বর্মিজ পরিবারের রীতি অনুসারে বিবাহের পর তাকে এরকম মৌন স্থবির ভাব ধারণ করতে হয়েছে।'

২। 'বর্মায় প্রত্যেক পাগোডা বা 'ফায়া'র সংলগ্ন বিহার বা 'ফুদিচং আছে; সেখানে শতশত ফুঙ্গি বা বৌদ্ধ-সাধু বাস করেন। এই সকল সাধুদের আহারের ব্যয় সমস্ত গৃহস্থেরা বহন করেন।...অনেক সময় অনেক ডাকাত সাধু আবাস গুলিতে আশ্রয় গ্রহণ করে; দিনের বেলায় ভিক্ষুর বেশ ধারণ করে ফুদিচঙে লুকিয়ে থাকে, রাত্রে সুযোগ হলেই ডাকাতি করতে বেরোয়।'

৩। 'রেঙ্গুনে প্রবেশের দ্বারস্বরূপ বন্দরখানা ছোট। এক একজন মানুষের নিরীহ চেহারার পিছনে যেমন কখন কখন একটা প্রচণ্ড জীবন-ইতিহাস প্রচ্ছন্ন থাকে, এই বন্দরের পিছনে সহরখানাও তেমনি প্রচ্ছন্ন রয়েছে। বাইরে থেকে তার কোন আভাষ পাওয়া যায় না। ডক পেরিয়ে বড় রাস্তায় পড়লেই প্রথমত দেখা যায় দক্ষিণ ভারতের কিষ্কিন্ধ্যা রাজ্যের মতোই কেবল অর্ধ-উলঙ্গ, মাথার সামনেটা কামান, পিছনে বেনে খোঁপা বাঁধা বা ঘাড়-পর্যন্ত-লম্বমান চুল মাদ্রাজী কুলি ও রিকশ-ওয়ালার দল। এক বৎসর পূর্বে এদেরই সঙ্গে বর্মী কুলিদের ভীষণ দাঙ্গা হয়ে গেছে, যেমন সে বছর ঢাকায় পুলিসের চোখের উপর হিন্দু ও মুসলমানে দাঙ্গা হয়েছিল।'

বলার কথা আর সুচিন্তিত মতামতের ঝুলি ভরে পাঠকের প্রত্যাশা এমনি করেই জাগিয়েছিল দুর্গাবতী ঘোষের লেখা ধারাবাহিক ভ্রমণ কাহিনি, যা পরে 'পশ্চিমযাত্রিকী' নাম নিয়ে বই হয়ে বেরোয় (১৯৩৬)। বাংলার বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী-চিকিৎসক এবং অন্যধারার সাহিত্যিক গিরীন্দ্রশেখর বসুর কন্যা দুর্গাবতী। সন্তানহীনা দুর্গাবতী স্বামী রবীন্দ্রচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে ১৯৩২সালে য়ুরোপ পরিক্রমা করেন। পথের শুরুতে রেল এবং জাহাজ পথে ভ্রমণ। যথারীতি অসুস্থতা এবং M.V. Victoria জাহাজের ভিতরকার বর্ণনা। দুর্গাবতীর তেজস্বী ভাব তাঁর

লেখাকে স্বতঃস্ফূর্ত করেছে : 'খাওয়া সেরে বাইরে ডেকে এলুম। এসেই সমুদ্রের হাওয়াটার কেমন একটা আঁসটে গন্ধ ও গরম ভাব পেলুম। খাবার ঘরটি সব কুলিং সিস্টেমে তৈরি। ভিতরে খানিকক্ষণ থাকলে বাইরে গরম অনুভব করা যায় না। ডেকে খানিকটা হেঁটে বেড়াব মনে করলুম কিন্তু মাথাটা ঘুরতে লাগলো; বিরক্ত হয়ে ড্রয়িংরুমে এসে একটা গদিওয়ালা চেয়ারে ব'সে রইলুম। স্টুয়ার্ড সামনে কফির পেয়ালা এনে হাজির। তাকে বলে দিলুম আমার ওসবে দরকার নেই। সে চলে গেলো। যাবার সময় দুবার ফিরে ফিরে আমায় দেখে গেলো। বিরক্ত হলুম, আ ম'লোযা আমি একটা হাতী না ঘোড়া? এত দেখবার কি আছে রে বাপু। মরছি নিজের জ্বালায়! একটু পরেই দেখি যে তার কফির ট্রে রেখে একটা প্লেটে ক'রে কয়েকটি পাতিলেবু ও বরফের টুকরো নিয়ে এসে আমার সামনে রেখে গেলো ও এবারে ফিরে যাবার সময় সামনের জানালাটা ভালো করে খুলে পর্দা সরিয়ে দিয়ে গেলো যাতে মুখে বেশ হাওয়া লাগে আর বরফের কুচি মুখে রাখবার জন্য ব'লে গেলো। তখন বুঝতে পারলুম আমার যে গা বমি বমি করছে সেটা ও আগে আগেই টের পেয়েছিল, কাজেই যাবার সময় অত দেখছিল। এসব কাজে এরা খুব তৎপর।'

দুর্গাবতীর ভাবনা মৌলিক, উপমা চয়ন অনন্য। প্যারিসে রাত্রিকালীন নৃত্যশালায় নর্তকীর নাচ দেখে লিখছেন, 'খুব ছোটবেলায় আমাদের বাড়ির এক পুরাতন ঝিয়ের মুখে গল্প শুনেছিলুম, পেরথম পক্ষের ইস্তিরি স্বোয়ামীর পাতে ব'সে খায়, দ্বিতীয় পক্ষের সাথে ব'সে খায়, আর তৃতীয় পক্ষের হ'লে একেবারে কাঁধে চড়ে খায়। এখন এই নাচ দেখে মনে হ'ল যে-কোন পক্ষের স্ত্রী হোক, শুধু খাওয়া কেন, এদের মত শরীর সুগঠিত হ'লে বোধ হয় কাঁধে চড়ে পৃথিবী পরিভ্রমণ করতেও পারা যায়।' লন্ডনে দুর্গাবতীরা গিরীন্দ্রশেখর বসুর বন্ধু বিখ্যাত মনোবিদ ডক্টর আরনেস্ট জোনস্ এর সঙ্গে দেখা করেন। লন্ডনের সব কিছুই নির্বিচারে ভালো বলতে বারে বারে ভেবেছেন দুর্গাবতী। কৃষ্ণভাবিনীর প্রণোদনা আর দুর্গাবতীর অনুপ্রেরণা যুগ বদলের সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেছে, ফলস্বরূপ বিচার ক্ষমতার অপক্ষপাত আত্মপ্রকাশ তাঁর লেখায় লন্ডনে, 'একদিন বাসে করে কোথায় যাচ্ছিলুম। পাশে এক ইংরেজ মহিলা তাঁর ছোট ছেলেকে নিয়ে যাচ্ছিলেন। ছেলেটি খেলা করতে করতে তার গালে কি রকম একটু কাদা লাগিয়ে ফেলেছিল। শিক্ষিতা জননী তৎক্ষণাৎ তাঁর রুমাল বার ক'রে নিজের মুখের থুথুর দ্বারা এক কোণ ভিজিয়ে ছেলের গালের কাদা তুলে দিলেন।... খামের উপর টিকিট মারা, ওভারকোটের দাগ ওঠান, খাম বন্ধ করা ইত্যাদিতে ভদ্রলোককেও থুথু ব্যবহার করতে দেখেছি। এরাই সভ্য ও শিক্ষিত ব'লে অহঙ্কার করে। আমাদের দেশের ধাঙ্গড় ও মেথর-যারা

অনবরত ময়লা পরিষ্কার করছে-তাদের ভেতরেও বোধ হয় থুথুর দ্বারা ছেলের মুখ মোছান, নিজের হাত ধোওয়ার ইচ্ছা কোন দিন হবে না।' এমন মণিমুক্তো অনবরত ছড়ানো 'পশ্চিমযাত্রিকী'-র পাতায় পাতায়। এই ভ্রমণকথার আর একটি বড় পাওনা পিতৃবন্ধু ডক্টর সিগ্‌মুণ্ড্‌ ফ্রয়েডের সঙ্গে ভিয়েনায় দুর্গাবতীদের মজাদার সাক্ষাৎ। এমনকী সেখানে আলোচনার প্রধান বিষয় হয়ে ওঠে বাঙালি মেয়ের পরিধান বারো হাত শাড়ির তেরো হাত গল্প! আর ইতালিতে *'আমরা রাস্তায় বেরলে মেয়ে পুরুষের ভিড় লেগে যেত। সবাই বলত 'ইন্দেয়ানো'।'*

প্রায় একই সময়ে ছোটো ছোটো এমন একই রকম ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখি কুমারী অমলা নন্দীর রচনায়। অমলা বারো বছর বয়সে ছয় মাসের জন্য তার বাবার সঙ্গে গিয়েছিল প্যারিসের 'ইন্টারন্যাশনাল কলোনিয়াল এক্সপজিশন' শিল্পমেলায় যোগ দিতে ১৯৩১-এ। তার বাবার ছিল তৎকালের বিশিষ্ট গয়না প্রস্তুতকারক হিসাবে দেশজোড়া পরিচিতি। ১৯৩৩-এ দেশে ফিরে এসে কুমারী অমলা তার এই সুদীর্ঘ দু'বছর য়ুরোপ ভ্রমণের উপর যে বই লেখে 'সাত সাগরের পারে' নাম দিয়ে, যার অকুণ্ঠ প্রশংসা করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু হেন ব্যক্তি (প্রসঙ্গক্রমে আগ্রহী পাঠকের স্মরণে থাকতে পারে রবীন্দ্রনাথের কৃষ্ণভাবিনী-বিরোধিতার কথা!)। অমলার বাবা অক্ষয় কুমার নন্দী এই বইয়ের 'গ্রন্থসূত্রে' লিখেছেন, *'...যাত্রাকালে যে কন্যা প্যারিস বলিতে পারস্য দেশ বুঝিয়াছে, মাত্র ছয়মাস ইয়োরোপবাসের পরেই তাহাকে বলিতে শুনিয়াছি, ... 'আমি এখন একাকী পৃথিবী ভ্রমণ করিতে পারি।'* এই য়ুরোপ ভ্রমণের ফলে কুমারী অমলা শুধুমাত্র পৃথিবীর পথে ভয়-রহিত হয়ে চলতে শিখেছিলেন তাই-ই নয়, ছ'মাসের জন্য বেড়াতে গিয়ে দু'বছর পৃথিবীর নানা দেশে কাটিয়ে তিনি দেশে ফিরে এসেছিলেন সুবিখ্যাত নৃত্যশিল্পী 'অপরাজিতা', ভবিষ্যতের শ্রীমতী অমলাশঙ্কর হয়ে। বেড়াতে গিয়ে এমন উত্তরণ ঔপনিবেশিক বাঙালিনীর জীবনে শুধু দুর্লভ-ই নয় অভূতপূর্ব ঘটনা বৈকি। এখানে কুমারী অমলার সারল্যমাখা চোখে দেখা বহিঃপৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ সমকালীন দুর্গাবতীর পরিণত চোখের থেকে ভিন্নমেরুর সুবাতাস বয়ে আনে পাঠকের মনে। অমলার জাহাজ ভাগ্য একটু অন্যরকম খুশিতে মোড়া। তাড়াতাড়িতে টিকিট করতে হয়েছিল তাই টোকিও-ইয়োকোহামা-কোবে-মজি-সাংহাই-হংকং-পেনাং হয়ে একটু ঘুরে কলম্বো আবার সেখান থেকে এডেন-পোর্ট সইদ-নেপল্‌স হয়ে ট্রেনে প্যারিস। সদ্য কৈশোরক অমলার মনে হয়, '...এ সমুদ্রের উপরে নীল আকাশ নীচেয় নীল জল।... মনে হ'ত এ জল যদি এমন গাঢ় নীল না হ'য়ে স্বচ্ছ হ'ত, তবে আমি অনায়াসে ঝাঁপ দিয়ে

পড়ে সাঁতার কাটতে পারতাম!' এরপর কিশোরীর সব থেকে বেশি মন টেনেছে যা, তা প্যারিসের কলোনিয়াল এক্সজিবিশন। ভারতীয় বিভাগের জন্য নির্দিষ্ট ছিল 'Pavilion de Hindoustan' নামক এক অট্টালিকা, যার প্রথম স্টলটি ছিল অমলাদের। ছ' মাস ধরে এই প্রদর্শনীর আলোহাওয়ার ইশারা আঁকড়ে ধরে অমলার মন অভিযোজিত হতে থাকে কতকটা বা মনের অগোচরে। তার দিন রাতের মজা, ভাষাশিক্ষার ক্লাস প্রথম দিকে ফরাসি না বলতে পারার অসুবিধা এইসব কিছুই কয়েকদিনের মধ্যেই আয়ত্তে চলে আসে। আয়ত্তে আসে ভদ্র বাঙালি লক্ষ্মীমেয়ের দেশভ্রমণের, মেধা প্রদর্শনের ঈপ্সা। জগতের হালচাল সম্পর্কেও জ্ঞান হয়েছিল টনটনে। তাই প্রদর্শনী সম্পর্কে অমলা লিখছে, *'প্রায় প্রত্যেক প্যাভিলিয়নের লোকেরাই আমাকে চিনে ফেলেছিলেন। আমি তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে গেলেই, নানারকম উপহারদ্রব্য দিয়ে আমাকে খুশি করতেন। যখন আমাদের স্টলে থাকতাম, তখন অনেক গ্রাহক আমার হাতে জিনিস কিনতে চাইতেন, তাঁরা বলতেন ভারতীয় এই লক্ষ্মী (lucky) মেয়েটির হাতের দেওয়া জিনিসটি আমার ঘরে থাকবে।... একটি ভারতীয় ছাত্র আমাদের স্টলে এসে, আমাদের স্টলের মেয়েদের সঙ্গে গল্প করে বৃথা সময় কাটাতেন। আমি মিস্ হেলেনের সঙ্গে পরামর্শ করে তাঁকে একদিন এমন জব্দ করেছিলাম যে, তা মনে পড়লে আমার বড় হাসি পায়।...কাজটি যতই আমাদের মন্দ হোক না কেন, যুবকটির বেশ আক্কেল হয়েছিল। তিনি আর বড় বাজে গল্প করে সময় কাটাতে আসতেন না।'* আবার উদয়শঙ্কর ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে দেখা এবং পরিচিত হওয়ার পর যখন নাচের দলে অমলাকে ডেকে নেন উদয়শঙ্কর তখন দু'বছর ধরে শুধু য়ুরোপ-ই নয়, সারা পৃথিবী চষে বেড়ায় কিশোরী অমলা নন্দী, বাবাকে ছেড়ে থেকে যায় নাচের দলের সঙ্গে। মা-কে তার মনে পড়ে, চিঠি লেখে। আর চুটিয়ে উপভোগ করে নতুন জীবন। *'...কত ফটোগ্রাফার আমাদের ফটো নিল, কত সিনেমাওয়ালা আমাদের গতিবিধি ও স্টেশনের জনতার চলচ্চিত্র তুলে নিল। নির্ধারিত হোটেলে পৌঁছতেই রিপোর্টারগণ এসে আমাদের ঘিরে ধরল। এবার রিপোর্টারগণের ধুমধাম বড় বেশি। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে তারা আমাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল, যা-তা হিজিবিজি প্রশ্ন-আমাদের উত্তরও তেমনি। সে সবই তাঁরা কাগজে বের করলেন।'...* ভারতীয় শাড়ি পরার ধরন, সিঁদুর ও আলতার ব্যবহার এসবও কাগজওয়ালাদের প্রশ্নের তালিকায় থাকত, কুমারী অমলা নন্দীর ভ্রমণকাহিনি তার সাক্ষ্য দেয়!

উপনিবেশের এই অনন্যা কন্যারা কেবল ভ্রমণ করে কাহিনি লিখেছেন তা মাত্র নয়। হরিপ্রভা তাকেদার মত মানুষ দেশের বিপদে, সাধারণ রাজনীতির থেকে

শতহস্ত দূরে থাকা জীবন কাটিয়েও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানে গিয়েছেন, থেকে গিয়েছেন সুদীর্ঘ সাত বছর; অসুস্থতা, যুদ্ধবিধ্বস্ততার সঙ্গে লড়েছেন সর্বশক্তি দিয়ে। বোমাবর্ষণে বাসভূমি চূর্ণ হয়ে গেলে টোকিও শহরে হোটেল ভাড়া করে থেকেছেন, দেখেছেন প্রিয়জনের অপ্রয়োজনীয় মৃত্যু। আর তারই মধ্যে 'আজাদ হিন্দ বাহিনি'র রেডিও স্টেশনে গিয়েছেন সংবাদ পড়তে, প্রায়ই পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে রাত্রিবেলায়। সঙ্গে থাকত পাসপোর্ট আর সামান্য কিছু গহনা। সরলা, অমলা দুর্গাবতী, শরৎরেণু সকলে এমন অসমসাহসিক না হলেও তাঁদের স্বাজাত্যবোধ প্রখর। তাঁদের লিখিত ভ্রমণকথার তীব্র চোখ ধাঁধানো আলোয় অবগাহন করতে করতেই চোখ ফেলি এক শ্যামল ভ্রমণকথায়। দেশের মাটি জলের আলিম্পন তাতে সুবাস মিশিয়ে দিয়েছে।

'নদীর ঘাটের কাছে/ নৌকো বাঁধা আছে/ নাইতে যখন যাই/ দেখি সে জলের ঢেউয়ে নাচে...' এমনি হারানো স্মৃতির ঢেউয়ে পা ডুবিয়ে আনমনে বসে রানী চন্দ বলেন হারানো স্বাদের বেড়াতে যাওয়ার গল্প। রানীর গল্পে নারী আছে, খুকি...আর আছে খুকির চোখের অনাবিল দৃষ্টি, নিরন্তর মেখে নেওয়া ভালোবাসার স্নিগ্ধ আশ্রয়। সে লেখায় তত্ত্ব নেই, জিজ্ঞাসা নেই, প্রতিবাদ নেই, বিশ শতক নেই, বিশ্বযুদ্ধের হাহাকার নেই... আছে শান্তি, আছে বেড়ানোর ছলাৎ-ছল্ আনন্দময় মধুস্মৃতি। রানী— শ্রীমতী রানী চন্দ (১৯১২-১৯৯৭) রবীন্দ্র এবং অবনীন্দ্র স্নেহধন্যা। রানী তাঁর মায়ের মৃত্যুর পর কলম ধরেছেন মায়ের কথা বলতে, মায়ের সঙ্গে বেড়াতে যাওয়া বাংলাদেশের ছোট্টগ্রাম গঙ্গাধরখোলার (যা পরে গঙ্গাধরপুর হয়ে ওঠে) অকিঞ্চিৎকর জীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ প্রবহমানতার কথা বলতে।

রানী অনেক বেড়িয়েছেন, পূর্বকালে-উত্তরকালে তাঁর ভ্রমণ রত্নখচিত পেটিকার অব্যর্থ সন্ধান। স্বামী শ্রী অনিল চন্দের সঙ্গে, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শান্তিনিকেতনের নাচের দলের সঙ্গে, স্বামীর অনুমতির পরোয়া না করে জেল ভ্রমণের ঘন রোমাঞ্চ কাহিনি, স্বামীর মৃত্যুর পর একা, অথচ কোন না কোন দলের সঙ্গী হয়ে বেড়ানোর নেশা তাঁকে অনবরত চালিত করেছে ভারতবর্ষের পথে-ঘাটে, আর পাঠক পেয়েছেন পরম রসের আস্বাদ, এ কেবলমাত্র বাঙালি পাঠকের কপালগুণ। রানীর ভ্রমণের সেই সব স্তরভেদ শুরু হওয়ার আগের এই সর্বপ্রথম ভ্রমণ-স্মৃতি। সদ্য বিধবা অল্পবয়সী মায়ের সঙ্গে, মামাদের সঙ্গে নৌকোয় চড়ে যাওয়া "আমার মা'র বাপের বাড়ি" (১৯৭৭, বিশ্বভারতী)। ছোট রানীর ছোট্ট ছোট্ট দেখা প্রায় পঞ্চাশ বছর পর বই লেখার সময় নীল আকাশের মতো বড়ো হয়ে উঠেছে।

রানীর জন্ম ১৯১২-য়। বাবা পুলিশকর্মী কুলচন্দ্র দে-র মৃত্যু ১৯১৬-য়, অর্থাৎ রানীর চার বছর বয়সে; তারপর মা নাবালক সন্তানদের নিয়ে উঠে এলেন ঢাকা শহরের এক প্রান্তে গেন্ডারিয়ায় 'আমগাছওয়ালা বাড়ি'তে। রানীর সবচেয়ে বড়দাদা, পরবর্তীকালের বিখ্যাত শিল্পী মুকুল দে তখন বিলেতে। ঢাকার 'ইডেন হাইস্কুল'-এর ছাত্রী পাঁচ বছর বয়সী রানী স্কুলের লম্বা গরমের আর পুজোর ছুটিতে মা, দিদি, শিশু ভাই আর দুই বড় দাদার সঙ্গে যান মামার বাড়িতে, আনন্দে আর উত্তেজনায় অস্থির ছোট্ট মন কেবলি আঙুল গুনতে মগ্ন, ঠিক তার পরেই, "*মামাদের একজন আসেন আমাদের নিয়ে যেতে। বুড়িগঙ্গার ঘাটে সারি সারি নৌকো বাঁধা— একমাল্লাই, দোমাল্লাই, তিনমাল্লাই, চারমাল্লাই....। যত মাল্লাই নৌকো ততজন মাঝি থাকে তাতে। আকারেও বড় হয় সেই অনুপাতে।...* এরপর পথ... বাংলাদেশের কোমল জলপথ বালিকার সমস্ত মনোযোগ টেনে রাখে। উত্তাল ধলেশ্বরী নদীতে নৌকো ঢুকলে সবার মনের উচাটন ভয় রানীর উৎসুক মনকে নিবিষ্ট করে তার মায়ের কার্যকলাপ দেখতে "মা চোখ বুজে শুয়ে থেকে থেকেই বলে ওঠেন..."

ধলেশ্বরী আইলো নাকি ও-ও মাঝিভাই?" ধলেশ্বরী এসেছে শুনে মা দু চোখ টিপে বালিশের ভিতর মাথাটা আরো গুঁজে দেন; 'রাম' নাম নেন।" তারও অনেক পরে আসে শান্তধারা, সেখানে নদীর চরে নেমে মায়ের হাতে বানানো লুচি আলুর দম হালুয়ার স্বাদের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় অর্ধশতবর্ষ পরে লিখতে বসা মা হারানো রানীর বোবাকান্নার মুক্তবাতাস। এই লেখায় তিনি 'পূর্ণশশী' মা কে পান, পান মায়ের মেয়েবেলার গল্প, মায়ের শিল্পীসত্তার সান্নিধ্য। মায়ের সমস্ত বিশিষ্টতার সঙ্গে উঠে আসে বাংলাদেশের হারিয়ে যাওয়া গ্রামজীবনের শুধু স্নিগ্ধ নয় স্মৃতিকাজল মাখা ছবি। রবীন্দ্রনাথ রানীকে বলেছিলেন, "*গ্রামের ভালোর দিকটা যেমন আছে খারাপ দিকও আছে। খারাপ দিকটা বাদ দিয়ে যা সুন্দর... সেইটুকুই শুধু ছবির মতো ফুটিয়ে তুলবি। গ্রামের জীবন তো আর পাবি না ফিরে।...*" অনেক বছর পরে হলেও রানী কথা রেখেছেন, লিখতে গিয়ে বিষ বাদ দিয়ে সুধাসাগরে মন সঁপেছেন। লেখার পর বলেছেন, "*মা লিখিয়ে নিলেন*"।

রানীর মন বরাবরই বিশ্বজগতের গন্ধ-স্পর্শের ভাগ পাবার জন্য উন্মুখ। তাঁর চেতনার রঙ তাঁর প্রতি ভ্রমণের বিবরণে বর্ণময় হয়ে বই-পাঠকের মনে ইশারা জাগিয়ে। আর অদ্ভুত ভাবে তাঁর বালিকা বয়সের চোখেও লেগে আছে সেই একই বিশিষ্টতা! এই মা'র বাপের বাড়ি যাওয়ার সময়কাল ১৯১৭-১৮ নাগাত। সদ্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পৃথিবীর উপর আছড়ে পড়েছে; রানী নিতান্তই শিশু হলেও তাঁর

অদ্বিতীয় দৃষ্টি তাঁর মনে যে প্রতিকৃতি তৈরি করেছে এইসময় থেকে, বহু বছর পরে লেখার সময় তাঁর সঙ্গে উঠে এসেছে জারিত মানবিক (হিউম্যানিটেরিয়ান) ভাব। স্মৃতিচারণাময় এই ভ্রমণকাহিনিতে সেখানকার নারীর অবস্থান, গ্রাম্য লোকাচার, সমাজজীবনের ছোটো বড়ো আদান-প্রদান, উৎসব, রীতি-রেওয়াজ, আচার বিচারের লৌকিক সংস্কৃতির ছবির যাথার্থ্য আমাদের চমৎকৃত করে। একালে ক্রমক্ষীয়মাণ হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির ছবি, সমাজের উঁচু-নীচু জাতি-বর্ণ-সম্প্রদায়ের প্রীতিচিত্র আজও অমলিন। *"মার নাম 'পূর্ণশশী', তাই ছোটো করে 'পুণি' বলেই ডাকেন মাকে বড়োরা। হোসেন মামা ছুটে গিয়ে বাড়িতে ঢুকে এক কাঁদি পাকা কলা এনে নৌকোতে তুলে দেন। হাঁকডাক করে গাছ থেকে এনে দুটো কাঁঠালও পাড়িয়ে দেন। ... খালের বাঁকে বাঁকে জোলা, ভুঁইমালী, শেখ মামাদের বাড়ী। খালে নৌকো ঢুকতে দেখেই তারা এগিয়ে আসে... কে আইলো? ...না বোসের বাড়ির পুণি বইনদি আইলো।... মুখে মুখে বার্তা চলতে থাকে। মা বাপের বাড়িতে পা দেবার আগেই দিদিমার কাছে খবর পৌঁছে যায়।... সঙ্গে সঙ্গে গোটা গ্রাম ভেঙ্গে পড়ে আমাদের ঘিরে। ঘর-পর সকলের সমান উল্লাস...যেন সবার ঘরেই কুটুম এল আজ।..."* আত্মীয়তার এমন ঔজ্জ্বল্য এখন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অমিল। এরপর বাপের বাড়ি *"মা'র বাপের বাড়ি...যেন মা'র সিংহাসনখানি। আট ভায়ের একমাত্র বোন। বড়োমামার পরে মা... মা'র পরে আর সাত ভাই। মা ছিলেন দাদামশায়ের চোখের মণি। সেই মণিটি দাদামশায় যেন গঙ্গাধরপুরের মাটিকে উপহার দিয়ে গিয়েছিলেন। গাঁয়ের গর্ব ছিলেন মা। মা এসেছেন, বাড়িতে উৎসব লেগে যায়।..."* মা সম্পর্কে রানী বলছেন আরও এক কথা, যার প্রতিধ্বনি শোনা গিয়েছে দাদা মুকুল দে'র আত্মজীবনী "আমার কথা" তেও, *"তরকারি কোটায় মা'র বরাবরের শখ।... মা'র তরকারি কোটার নিপুণতা শেখবার জিনিস...দেখবার জিনিস। বারকোষ ভরে লাউ কেটে দিয়েছেন মা—থরে থরে এমনভাবে কোটা লাউয়ের গোছা রেখেছেন...যেন যুঁই ফুলের এক স্তূপ। চোখে ভাসে ছবি... ঘোমটায় ঢাকা মামীমা কাঁধ বরাবর উঁচু করে বাঁ হাতের তেলোয় লাউভরা বারকোষ নিয়ে চলেছেন উঠোন পেরিয়ে রান্নাঘরে যেন পূজারিণী চলেছে মন্দিরের ফুল নিয়ে।"*

বালিকার চোখে ধরা দেয় নিত্যদিনের জীবনের উপকথা, যা এখন কেবলি আশ্রয় পেয়েছে ঝরা সময়ের কোলে। স্মৃতির অনুষঙ্গে চোখের উপর ভেসে ওঠে 'মধুখাম', বাঁধুনি বেতের নকশা, ঘরের টিনের চালের নীচের তক্তা পাতা কাঠের মই-সিঁড়ি লাগানো 'কার', 'তাক'-'শিকা'-'জোতের' লক্ষ্মীশ্রী মন্ডিত সংসার... *"ঘরে ঘরে কাঠের দরজা। প্রধান ঘরের দরজার পাল্লায় পদ্মলতার নকশা খোদাই। চৌকাঠের*

মাথায় মুখোমুখি দুই টিয়ে পাখি... ঠোঁটে লতা ধরা... সাদা মাটির পৈঠার উপরে কোমর অবধি গাবের কষে রাঙানো বাঁশের বেড়ার ঘরগুলি সুপারি নারকেল গাছের ফাঁকে ফাঁকে ছবি হয়ে ফুটে থাকে..." জন্ম নেয় নতুন বোধ: "*শশী বইনের মেয়ে সুনীতি... সবাই ডাকে 'সুনোতি' বলে, তার ডাক নাম 'খাঁদি'।...হঠাৎই যেন বড়ো হয়ে উঠল সুনোতি, যেমন লম্বায় তেমনি চওড়ায়। এর উপরে গায়ের বর্ণ কালো। পাত্রপক্ষ দেখতে আসে, দেখে চলে যায়, আর আসে না। মা আড়ালে দুঃখ করেন, মামীরা বলেন, 'যা কুৎসিত দেখতে'। শুনে অবাক হই, সুনোতি দিদির মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকি...এই তো নাক মুখ চোখ কপাল ঠোঁট থুতনি। কুৎসিতটা কোথায়?*" অথবা ঝুমকো জবার সাথে গড়ে ওঠে রানীর সখ্য, যেন দুজনেরই দুজনকে কী একটা বলবার আছে অথচ কেউই তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারছে না।

কিম্বা পরিবারের পরিসরে কানাকানি শুনে আবেগতাড়িত মনে অনেক কাল আগে বিয়ের চারদিন পরেই হারিয়ে যাওয়া রানীর বড়োমামার স্ত্রী বড়োমামীমাকে পাঁচ বছুরে রানী বলে ফেলেন, "*আচ্ছা বড়ো মামীমা, সবাই তো ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে... জন্মে জন্মে যেন এমন স্বামীই পাই, এই-ই নাকি সতী স্ত্রীর লক্ষণ? তা তুমিও কি তাই কর? বড়োমামীমা আঁতকে উঠলেন,বললেন, 'বাপরে, এ জন্ম এই স্বামী নিয়ে যা ভুগলাম, আর বলি না যে এমন স্বামীই চাই।" তা তবে কিরকম স্বামী চাও?' বড়ো মামীমা কী উত্তর দেবেন? চারিদিকে তাকান। আমিও ছাড়ি না। বেড়ার গায়ে আঠা দিয়ে আটকানো আছে অনেকগুলি ছবি...গান্ধীজী, তাজমহল, রবীন্দ্রনাথ, তিলক, কাঞ্চনজঙ্ঘা, মাথায় বিড়ে পাগড়ি বসানো বঙ্কিমচন্দ্র.... 'ঐ....ঐরকম' বলে বড়ো মামীমা আঙ্গুল দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের ছবিখানি দেখিয়ে হেসে ফেলেন।*" এই বড়োমামিমার সূত্রেই উঠে আসে হারানো ছড়া, স্তবের গান। অনেক সকালে ঘুম থেকে উঠে কৃষ্ণের শতনাম জপেন তিনি আর রানীর ঘুমঘোরে রেখে যান পরমহস্তাবলেপ (পরবর্তীকালে রানীর আঁকা বিখ্যাত কৃষ্ণলীলা সিরিজ স্মর্তব্য)... "*বড়োমামীমা মশারি খোলেন, বিছানা তোলেন...জোরে সব গুছিয়ে রাখেন, আর মুখে বলতে থাকেন....' যখন কৃষ্ণ জন্ম নিল দৈবকী উদরে/ মথুরাতে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করে।' ...চলতে থাকে নামের তালিকা, বুঝতে পারি বড়োমামিমা এবারে মাদুর গোটাচ্ছেন;... বলছেন.... দৈত্যারি দ্বারিকানাথ দারিদ্রভঞ্জন/দয়াময় দ্রৌপদীর লজ্জানিবারণ।' মাদুর গুটিয়ে কোনায় দাঁড় করিয়ে রাখলেন।*'

রানীর পরবর্তীকালের অন্যান্য ভ্রমণকথার মতো এখানেও তাঁর অনন্য নারী-দৃষ্টিতে ভর করে আসে গ্রাম্য মেয়েমহলের গল্প। কিরণকুমারী, জাফরানী, সুবাসী-বইন, সুশীলাপিসি, মুরলাপিসি, সুন্দরবোঠান, ফুলখুড়িদের মজলিস তারিয়ে

তারিয়ে উপভোগ করতে হয়, কেননা এ স্বাদ আজকের জগতে অতীত। এর মধ্যে পাটিসাপটার পুরের মতো করে গেঁথে দেওয়া আছে বিয়েবাড়িতে রামসীতার গান, আম কুড়োনোর মনকাড়া হুটোপুটি, কাঁচা-মিঠে আম ঝিনুক দিয়ে ছাড়িয়ে খাওয়ার লোভী সাধ, আছে 'মাঘমণ্ডল', 'পুণ্যিপুকুর', 'তারাব্রত', 'সেঁজুতি' ব্রত, 'লালুব্রত' কন্যার শৈশব ছবি আর ব্রতচারিণীদের মনের প্রচ্ছন্ন প্রতিযোগিতার মজাদার টুকিটাকি কথা। খুব অল্প করে চলে এসেছে চিনিমামার বসরায় যুদ্ধে যোগ দেওয়ার কয়েক লাইন ছবি। আছে পিয়ার্সন সাহেবের বাংলায় রানীর মা পূর্ণশশীকে লেখা চিঠিতে 'মাতাঠাকুরানী' র বদলে 'মাথাঠাকুরানী' সম্বোধনের খিলখিল হাসি; সঙ্গে আছে চোরের গল্প, সরলপ্রাণ প্রতিবেশীর গল্পে মোড়া নস্টালজিয়া, *"গ্রামের ছেলেরা পিসিকে কয়েকটা ইংরেজি কথা শিখিয়েছে। গুড ম্যান, ব্যাডম্যান, মানি, পজিশন, ভেরিমাচ...ইত্যাদি। এই কথাগুলি মহাউৎসাহে অতিগর্বভরে উচ্চারণ করেন পিসি গ্রামে মেয়ে দেখতে আসা পাত্রপক্ষের সামনে। 'ব্যাডম্যান' লোক হবেন না, 'গুডম্যান' মানুষ হন। পণের 'মানি' অতবেশি 'ভেরিমাচ' চাইলে কিকরে হবে? পজিশন করে রেখে দেখে কথা বলবেন তো?"*...

ভাগ্যিস তখন বিশ্বযুদ্ধ ছিল... বিশ্বায়ন ছিলনা বাঙালির জীবনে। আবার ফিরে আসি এক অনন্যা আধুনিকার কথায় যাঁর ভ্রমণকে মণ্ডিত করেছে শিল্পদৃষ্টির দুর্লভ বাসনা। উমা সিদ্ধান্ত। প্রখ্যাত ভাস্কর। জন্ম ১৯৩৩এ। জীবন সায়াহ্নে ভ্রমণ করেছেন, বলা ভালো ভ্রমণ করার সুযোগ পেয়েছেন শিল্পী য়ুরোপের মানস-অলিন্দে। সঙ্গী চিত্রকলা এবং শিল্পকলা বিষয়ক আরেক উজ্জ্বল বিশেষজ্ঞ সহপাঠী বন্ধু বিশ্বরাজ মেহরা। উমার করা ভাস্কর্যের মতই উমার লেখা বই 'ইউরোপের ডায়েরি' তে সহজ করে বলা কথা আর শিল্প ও শিল্পীর একান্ত আলাপচারিতা অত্যন্ত বিশেষত্বপূর্ণ। সমস্ত বই জুড়ে উমা ভারি কোমল। স্বচ্ছন্দ তাঁর চলন। এমনকি কথামুখে বেড়াতে বেরোনোর আগের কথাও বলেছেন তিনি। সে পথ এই নিত্যকার আধুনিকতার অভ্যাসের গণ্ডিতেও কোথাও যেন দৈনন্দিনতার বেড়া পেরিয়ে উঁকি দেয়নি। ভূমিকায় উমা নির্লিপ্ত স্বরে বলছেন, *"মনের এক সুপ্ত বাসনা—নিজের দেশের শিল্পকলার সঙ্গে পরিচিত হয়েছি, আসল কাজগুলি কোনও কোনও সময় দেখার সৌভাগ্যও হয়েছে। কিন্তু ঐ পাশ্চাত্যের বিখ্যাত কাজগুলি কি কোনও দিন স্বচক্ষে দেখার সৌভাগ্য হবে? দেখার এক তীব্র বাসনা। একবার সুযোগ এল। ফ্রেঞ্চ সরকারের স্কলারশিপে বাইরে যাওয়ার। কিন্তু বাড়ির থেকে আপত্তি এল। ছেলে তখনও খুব একটা বড় হয়নি। তাকে ছেড়ে যাওয়া উচিত নয়।"*... এ ঘটনা ৬ দশকের; কিন্তু অবশেষে যাওয়া হল ২০০২-এ। প্রায় চল্লিশ

বছর পর সেই বসন্ত এল নতুন শতাব্দীর মুক্তচিন্তার হাত ধরে। আর তারও ঠিক এক দশক পর ২০১২-তে বইয়ের পাতায় নেমে এলেন মিকেলেঞ্জেলো আর তাঁর পিয়েত্রা সান্তার মর্মর অধিবাস হাত ধরাধরি করে।

ভারি সুন্দর গল্প শুনিয়েছেন উমা "...কার্ডিনাল জিউলও মাইকেল অ্যাঞ্জেলোকে আদেশ করলেন মেদিচি বংশের নিজ গির্জা সান লোরেঞ্জোর বহির্ভাগ গড়ার জন্য। তার সঙ্গে আর যে কথা বললেন, পিয়েত্রা সান্তায় সব থেকে সেরা মর্মর পাওয়া যায় এবং কাজের জন্য সেখান থেকেই মর্মর আসবে।

মাইকেল আঞ্জেলো বলেন—মান্যবর আমি শুনেছি, সত্যই ওখানে শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য মর্মর পাওয়া যায়। কিন্তু কোন রাস্তা নেই।... সমতল থেকে এক মাইল উঁচু ওই শ্বেত মর্মরের জায়গা। সেখানে কেমন করে রাস্তা তৈরি হবে?

রাস্তা তৈরি করতে হবে। যাও চেষ্টা করো। আবার সেই কঠোর আদেশ। চোখের জলে ভাসতে ভাসতে উদ্‌ভ্রান্তের মতো রাস্তা হাঁটেন।' যে মর্মরশিল্পী তাকে হতে হয়েছে চিত্রকর, ব্রোঞ্জ শিল্পী এবং বাস্তুকার। আর এখন হতে হবে খনিকার। ও জানে না ও নিজে কী। কিন্তু সেই সময়ের দেশের মান্যবররা জানতেন তার মধ্যে এক মহান শক্তি আছে।

এই পিয়েত্রা সান্তাতেই শ্রেষ্ঠ শ্বেত মর্মরকে পাহাড়ের এক মাইল উঁচু থেকে নামিয়ে আনা সম্ভব করেছিলেন মাইকেল আঞ্জেলো। তাঁর কর্মকুশলতা ও অদম্য শক্তির কাছে শ্রমিকরা হার মেনে ছিল।...এই মহান কীর্তির পিছনে শিল্পীর পথ ছিল কন্টকাকীর্ণ। পিয়েত্রা সান্তায় মাইকেল আঞ্জেলোর প্রথম পদার্পণ ২৭শে এপ্রিল ১৪৩৫ সাল। বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকতে শুরু করেন। সেই বাড়িটারই এখন নাম 'বার মাইকেল আঞ্জেলো'।"....

তবে শুধু গল্পই নয় বাস্তবও উমার নজর কেড়ে নিয়েছে। মিলানে পৌঁছে লিখছেন, *"শহরটা দেখলাম। মজা লাগল পুরানো ঝরঝরে ট্রাম। খোলা জায়গায় অসংখ্য পায়রা। বাচ্চারা হাতে খাবার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।... নতুন ট্রাম ও বাস দেখলাম। খুব সুন্দর আধুনিক ব্যবস্থা। পুরনো ও নতুনের সমন্বয় দেখলাম। মিলান পোশাকের ফ্যাশানের জন্য বিখ্যাত। রাস্তার ধারে ধারে পোশাকের শো-রুম। নতুন নতুন ডিজাইনের জামা কাপড়। সুন্দর করে সাজানো শো-কেসের পাশের দেওয়ালে দেওয়াল লিখন।"* আমরা ভাবি আমাদের দেশেই বুঝি লোকেরা দেওয়াল লিখে নোংরা করে। তা নয়, পাশ্চাত্যের অতি সভ্য নাগরিকরাও দেওয়াল লিখে নোংরা করে।

ভ্রমণের শুরুতেই পিয়েত্রা সান্তা মাতাল করে তুলেছে প্রথম বাঙালিনী ভাস্করকে। বার মিকেলেঞ্জেলো থেকে মর্মর পাহাড়ের প্রাকৃতিক শোভা, পথপার্শ্বের

ক্যাফে কাস্টিং ফাউন্ড্রি দর্শনের সৌভাগ্য রোমকূপের গোড়ায় আনন্দের হিল্লোল তুলেছে উমার। সঙ্গে চলেছে য়ুরোপ ঘোরার প্রথম পর্যায়ে ইতালির বিখ্যাত স্থাপত্য এবং মিউজিয়াম দর্শনের আকুল তৃষ্ণার শান্তিবারি সেচন। এরই মধ্যে শিল্পীবন্ধুর ছাত্রছাত্রীদের দেওয়া ভোজসভায় অভিজ্ঞ নারীদৃষ্টি সঞ্চালনের ফলে অর্জিত আধুনিক নারীর সংকট নিয়ে প্রত্যক্ষ অনুভূতি *"এখানে দেখলাম অনেকগুলো মেয়ে যাদের বয়স চল্লিশের কাছে বা তার ওপরে, তারা সবাই নিজেদের জীবন সম্বন্ধে অত্যন্ত হতাশ। তাদের অনেকেরই সঙ্গী আছে। হয়তো তারা বিয়ে করে ঘরও বাঁধতে চায়। কেউবা একত্রে বসবাস করছে এবং সন্তানও হয়েছে। কিন্তু এরা সবাই বিয়ে করতে ভয় পায়। নবীন প্রজন্মের মূল্যবোধ যে পালটে গেছে। এরা কিছু গড়তে ভয় পায়...পাছে ভেঙে যায়।"*

পিয়েত্রা সান্তার এই কটা দিন অতীতের সঙ্গে সহবাস করেছেন উমা। শিল্পবোধিতার কলমে উঠে এসেছে তাঁর ভাষ্য *"এই 'বার মাইকেল আঞ্জেলো'তে বসে রোজই কফি খেতাম। আর ভাবতাম কতযুগ আগের কথা। এই মহান শিল্পীকে আমি অনুভব করতে পারি সাহিত্যের গল্প গাথার মধ্যে দিয়ে, ইতিহাসের মধ্যে দিয়ে। সেই ইতিহাসের গল্প কতটা সত্য কতটা কাল্পনিক জানি না। তবে সত্য উপলব্ধি করতে পারি তাঁর অমর শিল্প সৃষ্টির মধ্যে। তাঁর সবকিছু যন্ত্রণা বেদনা দুঃখ অপমানের গরল থেকে উঠেছে এই অমৃতের ধারা। কন্টেসিনা ও ক্লারিসার পবিত্র ভালোবাসা না পাওয়ার যন্ত্রণা থেকে রচিত হল দুটি নারীমূর্তি ঊষা ও রাত্রি। পবিত্র কন্যা মূর্ত হল তাঁর ছেনি হাতুড়ি মর্মরের প্রতিকৃতিতে। তরুণী কন্যা পরিণত পরিশ্রান্তা জননী, স্নিগ্ধ ও শুদ্ধ-সেই হল রাত্রি। ঊষা গড়ে উঠল অর্ধচেতনার এক স্বপ্নময় সত্তার মধ্যে, সেই মাহেন্দ্রক্ষণ দিনের আলো ফোটার অপেক্ষায়।..."* শুধু এইই নয়, লেখকের শিল্পীস্বরূপের অভিজ্ঞান সমস্ত বই, পাতার পর পাতা জুড়ে নবীন কিশোরী মেয়ের মতোই লীলা চঞ্চল। অনাদ্যন্ত কালের গিয়াম্‌বোলগ্‌নার The Rape of the Sabine Women থেকে শুরু করে আধুনিক ভাস্কর ইগর মিটোরাজ এর কাজের শিল্প সৌকর্য তাঁকে মোহিত করেছে, শিল্পী নন, একজন সমকালীন মানুষ। আর সমকালের সঙ্গে তাঁর হৃদয় ও মস্তিষ্কের চলিষ্ণুতার নানান বর্ণময় উদাহরণ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে উমা সিদ্ধান্তের লেখায়। রেমব্রান্টের বাড়ি দেখা থেকে সমকামিতা সমস্যা প্রসঙ্গেই তাঁর ভ্রমণকাহিনি ভরপুর। মধুর মিশেল দিয়েছে নারীমনের বিশেষ দৃষ্টিকোণ, *"আমস্টারডাম টাউন হলেও দেখলাম অনেক পুরোনো ছবি। একটা ছবি তো ঐতিহাসিক যুগের ইতিহাস বলা যায়। বিষয়বস্তু মেয়েদের কতটুকু অধিকার ছিল সেই যুগে। একটি বিচারসভার দৃশ্য। একটি মেয়ে পাবলিক পানশালায় উপস্থিত*

হওয়ায় তাকে অপরাধী হিসাবে বিচার করা হচ্ছে। কারণ সেই যুগে মেয়েদের পানশালায় প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। এমন এক প্রতিবাদী ছবি শহরের টাউন হলে রাখা আছে দেখে ভাল লাগলো।" মানব-প্রজাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উমাকে কিন্তু ভাবিয়েছে আমস্টারডাম শিল্পশালার পোস্টার, 'No More Art'

উমা স্বামীর মৃত্যুর পর ভ্রমণ করেছেন য়ুরোপ। ততদিনে তিনিও বার্ধক্যের ছায়ায়। তবু তাঁর মননের মধু আদ্যোপান্ত বিস্ময়করী শাশ্বত। কেবলমাত্র সমকালীন নয়, তা চিরকালীন। আর তাঁর এই বিশেষ সেক্যুলার দৃষ্টিভঙ্গি বাঙালি মেয়ের কলমে নতুন তো বটেই। আগামীর জন্য সযত্নরক্ষিত দীপদণ্ডের একটি শিখা হিসেবে তাঁর ভূমিকা কিছুতেই তাই খাটো করে দেখার নয়। এঁরা কয়েকজন মাত্র। বাংলা ভ্রমণকাহিনির পথে সারে সারে আলো হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন অসামান্য সব মেয়েরা, কালে কালে তাঁদের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। বাঙালিনীর এই পৃথিবী বিজয়ের সুস্বাদু ইতিহাস খুব তাড়াতাড়ি লেখা হোক। অলমিতি।

ঋণস্বীকার :

১। "কৃষ্ণভাবিনী দাসের ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা"; সম্পাদনা ও ভূমিকা: সীমন্তী সেন; স্ত্রী; কলকাতা; ডিসেম্বর ১৯৯৬।

২। "বঙ্গমহিলার জাপান যাত্রা ও অন্যান্য রচনা", 'তাকেদা হরিপ্রভা'; সম্পাদনা ও সংকলন: ড. মঞ্জুশ্রী সিংহ; ডি এম লাইব্রেরি সংস্করণ; কলকাতা জানুয়ারি ২০০৯।

৩। "পথের কথা শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে বঙ্গমহিলার ভ্রমণ"; সম্পাদনা: অভিজিৎ সেন, উজ্জ্বল রায়; স্ত্রী; কলকাতা; আগস্ট ১৯৯৯।

৪। "পশ্চিমযাত্রিকী"; "দুর্গাবতী ঘোষ, সম্পাদনা: অভিজিৎ সেন, অনিন্দিতা ভাদুড়ী; দে'জ পাবলিকেশন এবং স্কুল অব উইমেন স্টাডিজ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়; কলকাতা; জানুয়ারি ২০০৭।

৫। "সাত সাগরের পারে, য়ুরোপ ভ্রমণ বৃত্তান্ত"; অমলা নন্দী, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং; কলকাতা; ১৪১৩।

৬। "আমার মা'র বাপের বাড়ি", রানী চন্দ, বিশ্বভারতী; কলকাতা; প্রথম প্রকাশ ১লা বৈশাখ ১৩৮৪ পুনর্মুদ্রণ মাঘ: ১৪১৩।

৭। "ইউরোপের ডায়েরি"; উমা সিদ্ধান্ত, রক্তকরবী; কলকাতা; অগাস্ট ২০১২।